সায়েন্স ফিকশন

তিনুদের রোবট টিচার

সায়েন্স ফিকশন

তিনুদের রোবট টিচার

দিলরুবা নীলা

সম্প্রীতি প্রকাশ

উৎসর্গ

কবি গীতিকার শিশুসাহিত্যিক লোক-গবেষক

ডঃ তপন বাগচী

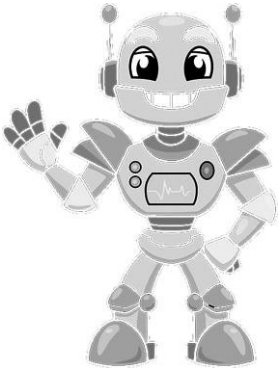

রোবট নিয়ে ছোটো ছোটো ছেলেমেয়েদের জল্পনাকল্পনার শেষ নেই। আমি তাদের বলি, এমন একদিন আসবে যেদিন রোবটরা হবে তোমাদের বন্ধু, সহকর্মী, সমস্যাসমাধানকারী। তখন তারা অবিশ্বাসের চোখে আমার দিকে তাকায়। কেউ কেউ বড়োবড়ো চোখ করে বলে তারা কি আমাদের মতোই দুষ্টু হবে? কান্না পেলে কাঁদবে? হাসি পেলে মিষ্টি করে হাসবে তো?

তাদের এইসব প্রশ্নের উত্তর দিতেই আমার এই 'সায়েন্স ফিকশন তিনুদের রোবট টিচার' বইটি লেখা।

কে জানে বইটি কৌতূহলী ছেলেমেয়েদের কৌতূহল মেটাতে পারবে কিনা! তবে গল্পগুলো তারা বেশ মজা করে পড়বে, এ ব্যাপারে আমি নিশ্চিত।

দিলরুবা নীলা

সূচি

মায়ের মতো ♦ ১১
একজন অধ্যাপক ও
একটি মানবিক রোবট ♦ ১৫
রোবট পাখি ♦ ২২
প্রিয়জন ♦ ২৫
রোবো হিরো ♦ ৩৫
জেনিফার ♦ ৪২
মিষ্টি হাসির মেয়েটি ♦ ৪৯
টান ♦ ৫৯
তিনুদের রোবট টিচার ♦ ৭৫

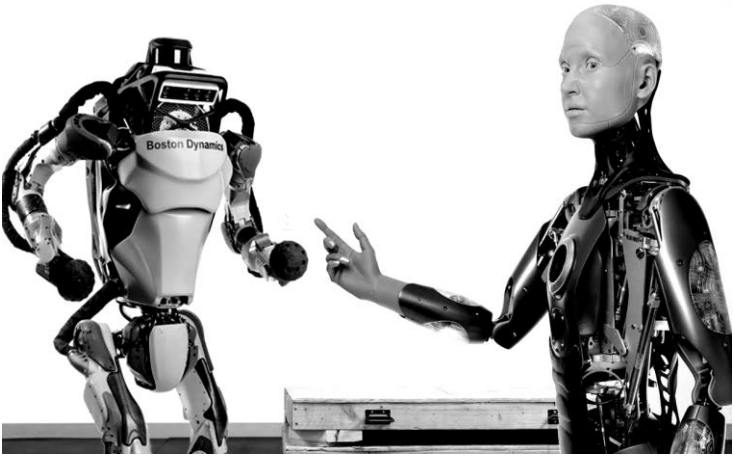

মায়ের মতো

মা মারা যাবার পর থেকে নিজের রুম থেকে খুব একটা বাইরে আসে না জেমস। একা একা রুমে দরজা আটকিয়ে বসে থাকে। খুব ডাকাডাকি করলে বের হয়। গবেষণাগারেও তাকে পাওয়া যায় না। অথচ ওই সবচেয়ে ভালো বিজ্ঞানী রোবট। আসিফ এসব কারণে ওর প্রতি ত্যাক্ত বিরক্ত, কিন্তু ওর চোখের দিকে তাকালে সে কিছুই বলতে পারে না। কী শান্ত! কী মায়াবী, ওর দুটো চোখ। অবশ্য চোখ মায়াবী বলেই তাকে বকুনি দেওয়া যাবে না এমনটা নয়। জেমসকে কিছু না বলার কারণ অন্য। তাহলো আসিফের মা ওকে খুব ভালোবাসত। আসিফের নিজের উপরই রাগ হয়। কী কারণে যে রোবটের কারখানা থেকে ওকে বাসায় এনেছিল!

মনে পড়ে সেইসব কথা। রোবটের কারখানার চারজন পার্টনারের মধ্যে আসিফ একজন। কাজের সুবিধার জন্য ওরা একদল বিজ্ঞানী রোবট তৈরি করেছিল এবং এসব রোবটরাই

একজন অধ্যাপক ও একটি মানবিক রোবট

আজ কেমন আছেন? শরীর বিশেষ ভালো তো? সেঁকা পাউরুটিতে মাখন লাগাতে লাগাতে অধ্যাপক জাবিরকে প্রশ্নটা করে রোবট শেরি।

শেরির প্রশ্নটা মানবিক হলেও প্রশ্ন করার ধরনের মধ্যে ভীষণ রকম আন্তরিকতার অভাববোধ করেন অধ্যাপক জাবির। তাই তিনি প্রশ্নটার উত্তর দেবার প্রয়োজন মনে করেন না। চট করে তিনি মানুষের সাথে শেরির তুলনা করতে বসে যান। এই মুহূর্তে একজন মানুষ হলে কী করত?

একজন মানুষ এ প্রশ্নটি করার সময় চেহারার মধ্যে একটা মায়া মায়া ভাব আনত এবং অবশ্যই তার কপালে হাত রেখে

তাপমাত্রা পরীক্ষা করত এবং ডাক্তারী ভাষায় যত রকমের পরামর্শ আছে তা দিত।

তিনি মনে মনে এ সিদ্ধান্তে আসেন যে, শেরিকে তিনি এখনো অতটা মানবিক করতে পারেননি, যতটা তিনি আশা করছেন। বিক্ষিপ্ত মন নিয়ে তিনি নাস্তার টেবিল থেকে উঠে যান নাস্তা না করেই। যেতে যেতে পিছনে ফিরে তাকান। মনে ক্ষীণ আশা শেরি তার পিছনে পিছনে নাস্তা নিয়ে আসবে।

নাহ্ সেটাও হলো না। তিনি হতাশা নিয়ে বিছানায় গা এলিয়ে দেন। অসুস্থ ও ক্লান্ত শরীরে কখন চোখ লেগে আসে বুঝতে পারেন না তিনি। যখন ঘুম ভাঙে তখন দেখতে পান মাথার কাছে টি-টেবিলে দু' স্লাইস পাউরুটি, একটা কলা, আর এক গ্লাস জুস এবং সাথে একটা চিরকুট। তাতে লেখা—

'আপনার শরীর আজ কেমন? বিশেষ ভালো তো? ঘুম থেকে উঠে খেয়ে নেবেন। আমি বাজারে যাচ্ছি। আপনি তো আমার ঘাড়ে সব দায়িত্ব দিয়েই বেঁচে যান। সব ঝামেলা আমাকেই পোহাতে হয়।'

চিরকুট পড়ে ঠোঁটের কোনে হাসির ঝিলিক দেখা দেয় অধ্যাপক জাবিরের। শেষের লাইনগুলো তার খুব পছন্দ হয়। তবে কি তিনি সফল? হঠাৎ পেটে ক্ষুধাটা চাড়া দিয়ে উঠল তার। নিশ্চিত মনে তিনি পাউরুটিতে কামড় দেন, চুমুক দেন জুসের গ্লাসে।

বিশ্ব রোবট উন্নয়ন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক জাবির দীর্ঘদিন ধরে রোবট মনস্তত্ত্ব নিয়ে একটি গবেষণাপত্র তৈরি করছেন। তার তৈরিকৃত কয়েকটি বিশেষ ধরনের মানবিক রোবট চারিদিকে হুলস্থুল বাঁধিয়ে দিয়েছে। চড়াদামে বিক্রিও হচ্ছে সেগুলো। কিন্তু তিনি আত্মতৃপ্তি খুঁজে পাচ্ছেন না। কোথায় যেন কমতি

রোবট পাখি

রাত দুপুরে কোকিলের গানের শব্দে ঘুম ভেঙ্গে যায় অধ্যাপক মঈনের। তিনি লাফ দিয়ে বিছানায় বসে পড়েন। রুমের দরজা খুলে বারান্দায় এসে দেখেন রোবট কোকিলটা আপন মনে কুহুকুহু করছে। এ দৃশ্য দেখে তিনি হাসবেন না কাঁদবেন এই মুহূর্তে তিনি বুঝতে পারছেন না। তার তৈরি এই বিশেষ কোকিল রোবটের নাম কুহু। তিনি কুহুর ভিতরের সিস্টেমটা এমন করেছেন যে সে আর দশটা সত্যিকারের কোকিলের মতো বসন্ত ঋতুতে ডেকে উঠবে, কিন্তু সে কেন এই মধ্যরাতে ডেকে উঠছে কে জানে? তার মধ্যে এখন রীতিমতো বর্ষা ঋতু চলছে।

পায়ে পায়ে অধ্যাপক মঈন এগিয়ে যান কুহুর কাছে।

তোমার সমস্যা কী বলো তো। বর্ষার মধ্যরাতকে বসন্তের আনন্দময় দিন বানিয়ে ফেললে?

কেন, স্যার আমি তো বসন্তকালেই ডাকছি? কুহুর কাটকাট জবাব।

বসন্ত! এখন বসন্ত নয়, বর্ষা।

কিন্তু আমার সিস্টেম বলছে অন্য কথা। কুহুর কণ্ঠতে আত্মবিশ্বাস টের পান অধ্যাপক মঈন।

কী বলছে তোমার সিস্টেম?

সে বলছে যখন প্রখর শীত বা অদ্ভুতুড়ে গরম থাকবে না আর যখন আশেপাশের ফুলের গন্ধ টের পাব, তখন বসন্তকাল।

আজ দিনভর তীব্র গরম শেষে মাঝরাতে ঝুম বৃষ্টি নেমেছে। চারিদিকে না-গরম না-শীত অবস্থা। অধ্যাপক মঈন এই মধ্যরাতে ফুলের গন্ধ টের পান।

বৃষ্টিতে ভিজে গাছভর্তি কদমেরা তীব্র গন্ধ ছড়াচ্ছে।

কুহুর কথা শুনে এই না-গরম না-শীতের মধ্যেও ঘামতে শুরু করেন অধ্যাপক মঈন। দীর্ঘদিন ধরে তিনি রোবট বিষয়ে গবেষণা করে অত্যাধুনিক সব রোবট তৈরি করে চারিদিকে হুলস্থুল বাঁধিয়ে ফেলেছেন। লোকজন সেসব রোবট কিনে তাদের দিয়ে গৃহস্থালী কাজকর্ম, ব্যবসায়িক কাজ, অফিসের নানা কাজ, ড্রাইভিং, সব করাচ্ছে। এবং সবখানেই অধ্যাপক মঈনের আবিষ্কৃত রোবটের জয়জয়কার।

হঠাৎ তার মাথায় চাপল তিনি রোবট পাখি বানাবেন। দোয়েল, কোকিল, ময়না টিয়া সব পাখি। পাখি তৈরির ভূত মাথায় চাপতেই তিনি তৈরি করে ফেলেন অসংখ্য কোকিল।

শহরের যানবাহনের কোলাহলের শব্দে একটু নিখাদ প্রকৃতির ছোঁয়া পেতে অধ্যাপক মঈনের আবিষ্কৃত অসংখ্য কোকিল কিনে নিয়ে গেছেন লোকজন।

রোবো হিরো

এক কাপ কফি হবে? ইরেশ ঘরে ঢুকেই মিলির দিকে তাকিয়ে বলল।

মিলি অবাক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল ইরেশের দিকে। সে ততক্ষণে আয়েশ করে সোফায় বসেছে।

মিলি ইরেশের কথার উত্তর না দিয়ে রান্না ঘরে ঢোকে। তার পেছনে পেছনে অভি।

এটা রোবটই তো? মিলি, স্বামী অভির দিকে তাকিয়ে জানতে চায়।

হ্যাঁ রোবট, তোমার চাহিদা মতো অতি সংবেদনশীল রোবট। অভি জবাব দেয়।

তাহলে কি রোবটরা এখন খাবার খেতে শুরু করেছে?

তাতো জানি না। ইরেশকেই জিজ্ঞেস করো।

ওর নাম ইরেশ বুঝি? মিলি কফির কাপে চিনি মেশাতে মেশাতে অভিকে জিজ্ঞেস করে।

হ্যাঁ ওর নাম ইরেশ, বেশ সুন্দর না নামটা?

হ্যাঁ সুন্দরই তো। মানুষ মানুষ নাম।

মিলি কফির কাপ হাতে ড্রইং রুমে আসে। কাপটা এগিয়ে দেয় ইরেশের দিকে।

তুমি কফি খাও, ইরেশ?

না খাই না, কফির ধোঁয়া দেখি। গরম গরম কফির কাপে যখন ধোঁয়া ওঠে তখন দেখতে ভালো লাগে।

ইরেশ মিলির হাত থেকে কফির কাপটা নিয়ে এমনভাবে তাকিয়ে তাকিয়ে ধোঁয়া দেখতে থাকে, যেন জীবনের যাবতীয় আনন্দ ওই ধোঁয়া দেখার মধ্যে।

অভির কাছে মিলি আবদার করেছিল একটা সংবেদনশীল রোবট কিনে দিতে। মিলির আবদার রাখতেই ইরেশকে ভালো একটা দামে কিনে আনা হয়েছে।

ইরেশ আসার পর থেকে মিলি বেশ আরামেই আছে। ইরেশ বাজার করা থেকে শুরু করে লন্ড্রীতে যাওয়া, বাইরের সমস্ত কাজ করে। এমনকি ঘরেও টুকটাক সাহায্য করে।

মিলি আর অভি দুজনের সংসার। অভি সকালে অফিসে যায় সন্ধ্যায় আসে। আর যাই হোক ইরেশ আসায় মিলির কিছুটা নিঃসঙ্গতা দূর হয়েছে। বিকেল বেলা কফির কাপ হাতে ইরেশের সাথে গল্প করে অনেকটা সময় কাটানো যায়। যেহেতু ইরেশ একটি সংবেদনশীল রোবট তাই সে মিলির কষ্টের গল্প শুনলে দুঃখ পায় আবার আনন্দের কথা শুনলে হেসে কুটি কুটি হয়।

ইরেশকে নিয়ে অভি মিলির সংসার খুব ভালোই কাটছিল। হঠাৎ করে ইরেশের মাঝে অদ্ভুত পরিবর্তন দেখা দেয়। যে ইরেশ

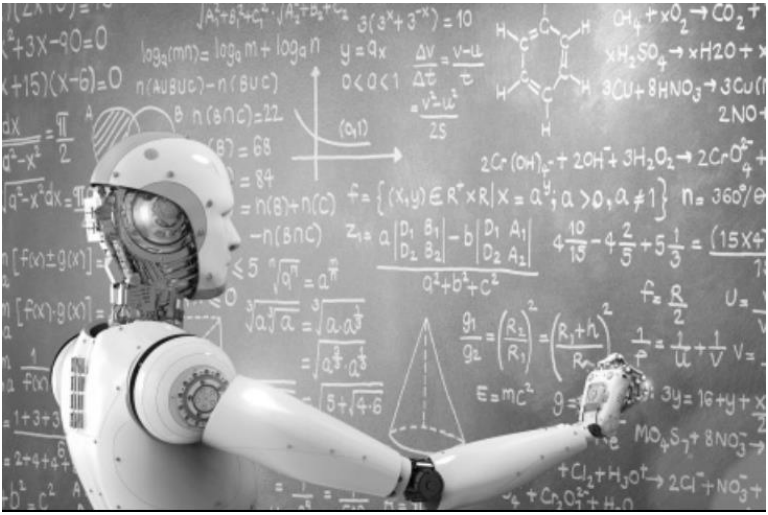

তিনুদের রোবট টিচার

তিনুদের স্কুলে আজ নতুন টিচার আসবেন। তা নিয়ে ক্লাসে জল্পনাকল্পনার শেষ নেই। যদিও নতুন টিচার নিয়ে জল্পনাকল্পনার কিছু নেই কারণ কিছুদিন পরপরই তাদের নতুন নতুন টিচার আসছেন আবার কেউ কেউ চলেও যাচ্ছেন। আজকের ব্যাপারটা একটু ব্যতিক্রম কারণ আজ তাদের স্কুলে একজন রোবট টিচার আসবেন। তিনুদের স্কুলে এই প্রথমেই কোনো রোবট টিচার আসছেন। তাই সবাই প্রচণ্ড আগ্রহ নিয়ে অপেক্ষা করছে। তিনু এবার ক্লাস ফোরে পড়ছে। সে যেমন ভালো ছাত্রী তেমনি ভীষণ রকম দূরন্ত। সবাইকে অবাক করা সব ধাঁধা ধরে ধরে কুপোকাত করাই তার কাজ। সে টিচারদেরও ছাড় দেয় না। এই তো কিছুদিন আগে আফরোজা ম্যামকে কিছুক্ষণের জন্য ভড়কে দিয়েছিল সে।

আফরোজা ম্যাম ওদের বিজ্ঞান পড়ান। তিনি পড়াচ্ছিলেন, উদ্ভিদ কীভাবে খাদ্য তৈরি করে। হঠাৎ তিনু উঠে দাঁড়িয়ে বলে,

ম্যাম একটা ধাঁধা জিজ্ঞেস করি?

ম্যাম বললেন, একদমই না পড়ার সময় কোনো ধাঁধা নয়। পড়ার সময় শুধুই পড়া। অমনি ক্লাসের সবাই একযোগে চিৎকার করে উঠল। ম্যাম একটা ধাঁধা, প্লিজ ম্যাম প্লিজ।

অবশেষে অধিকাংশের বিশেষ অনুরোধে আফরোজা ম্যাম ধাঁধার উত্তর দিতে রাজি হলেন।

বলো তিনু তোমার বিখ্যাত ধাঁধা।

ম্যাম, বলেন তো ঢাকা ঘাস সাদা কেন?

ম্যাম তো প্রচণ্ড রেগে গিয়ে বলে উঠলেন, আমি দীর্ঘদিন ঢাকায় থেকেছি। ঢাকার ঘাস কখনো সাদা দেখিনি। ঘাস সব সময় সবুজ হয়, বুঝেছ?

শুধু ঘাস কেন অধিকাংশ গাছের পাতাই সবুজ। এর কারণ ক্লোরোফিল। বুঝেছ?

ম্যামের উত্তরে ক্লাসের সবাই হো-হো করে হেসে উঠল।

আফরোজা ম্যাম কিছুক্ষণ চুপ থাকলেন। তারপর বুঝতে পারলেন প্রশ্নটা বুঝতে তার ভুল হয়েছে। প্রশ্নটা ছিল ঢাকা ঘাস, ঢাকার ঘাস নয়।

আজ রোবট টিচার আসার আগে তিনুদের ক্লাসে এসে হেডস্যার বলে গেলেন, তোমাদের যে রোবট টিচার আসবেন তার নাম মিস টুকটুকি।

তোমরা তাকে টুকটুকি ম্যাম বলেই ডাকবে। খবরদার রোবট ম্যাম বলবে না। তিনি কিন্তু অংকের জাহাজ সুতরাং তাকে কেউ অযথা বিরক্ত করবে না। তোমাদের সৌভাগ্য তোমরা একজন গণিতবিদ রোবটকে টিচার হিসেবে পেয়েছ।

টুকটুকি ম্যাম যখন তিনুদের ক্লাসে ঢোকে তখন ক্লাসের সবাই অবাক। এ-কি এতো রোবট নয়।

এতো মানুষ। জলজ্যান্ত মিষ্টি একটা মেয়ে।

টুকটুকি ম্যাম পরে এসেছেন টকটকে লেমন রঙের শাড়ি। চুল খোঁপা করে বেঁধেছেন, খোঁপা দেখলেই বোঝা যায় ম্যামের চুল অনেক লম্বা।

চোখে গাঢ় করে কাজল। আহা কী মিষ্টি ম্যাম, সবাই অবাক।

আমি টুকটুকি, তোমাদের নতুন শিক্ষক। আমি তোমাদের মতো মানুষ নই, রোবট। তোমাদের মস্তিষ্কের চেয়ে আমার মস্তিষ্ক গাণিতিক বিষয়ে পঞ্চাশগুণ উন্নত। সুতরাং যেকোনো গাণিতিক সমস্যার সুন্দর, গ্রহণযোগ্য এবং সহজ সমাধানের জন্য তোমরা আমার কাছে আসবে। আমি তোমাদের সাহায্য করব। ক্লাসের সবাই টুকটুকি ম্যামের কথায় স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল। এইবার তারা গণিতে পাকা হয়ে উঠবে নিশ্চিত।

কিন্তু দুষ্টু তিনুর স্বস্তি নেই। সে শুধু ভাবছে আর ভাবছে। কীভাবে ধাঁধার চক্করে ফেলে ম্যামকে আটকানো যায়।

হঠাৎ সে চিৎকার করে ওঠে, ইউরেকা! ইউরেকা!

কি হলো, তুমি চিৎকার করছ কেন? কী নাম তোমার? কোনো সমস্যা?

না ম্যাম, আমি তিনু। আমার রোল এক। রোল এক হলে কী হবে, আজ একটা অংকের সমস্যা মাথায় ঢুকেছে কিছুতেই মেলাতে পারছি না। আপনি কি আমাকে একটু সাহায্য করবেন?

অবশ্যই করব। বলো কী সমস্যা।

ম্যাম এক যোগ এক কখন তিন হয়?

আরে এ আর এমন কঠিন কি, দাঁড়াও এক্ষুনি বের করে দিচ্ছি।

টুকটুকি ম্যাম একের সাথে এক যোগ করলে কখন তিন হয়, ভাবতে লাগলেন তার উন্নত মস্তিষ্ক যা মানুষের তুলনায় কমপক্ষে পঞ্চাশ গুণ মেধাবী। কিছুতেই অংকটা মেলাতে পারলেন না। বার বার এক যোগ এক দুই হতে লাগল। ওদিকে ঘণ্টা বেজে গেল।

আমি তোমাদেরকে কাল উত্তরটা বলব।

বলেই টুকটুকি ম্যাম চলে গেলেন।

পরপর তিন দিন স্কুলে দেখা গেল না টুকটুকি ম্যামকে।

তিনু জানত রোবটদের মাথায় একটা সমস্যা ঢুকিয়ে দিলে তার সমাধান না করা পর্যন্ত তারা ঐ সমস্যা নিয়েই ভাবতে থাকে।

টুকটুকি ম্যামের জন্য তিনু মায়া অনুভব করে। তৃতীয় দিনের মাথায় তিনু তার কয়েকজন বন্ধু নিয়ে টুকটুকি ম্যামের বাসায় চলে যায়।

ম্যাম বসে আছে চেয়ারে, সামনে টেবিল। মেঝেতে অসংখ্য কাগজ ছিঁড়ে ছিঁড়ে ফেলা তাতে শুধু লেখা এক যোগ এক দুই।

ম্যাম আমি উত্তরটা বলে দিই? তিনুর কথায় পিছনের দিকে তাকায় টুকটুকি ম্যাম।

দেখে তিনু দাঁড়িয়ে।

বলো, আমি কিছু ভাবতে পারছি না।

ম্যাম এক যোগ এক তিন হয় অংকটা ভুল হলে।

টুকটুকি ম্যাম অবাক চোখে তাকায় তিনুর দিকে। তিনুর ঠোঁটে বিজয়ের হাসি।